# ব্রিফিং নোট

মার্চ ২০২৪

২

Funded by the European Union

Global Gateway

## জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

### সংলাপ সম্পর্কে

এসডিজির মূল দর্শনই হচ্ছে কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এ দর্শন বাস্তবায়নের জন্য যে কর্মকৌশল গ্রহণের কথা বলা হয়েছে তা হলো হোল অব সোসাইটি অ্যাপ্রোচ বা সমগ্র সমাজ পদ্ধতি। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আর এসব কর্মসূচিতে সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া ও তা ব্যবহারের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে জাতীয় বাজেট। এ বাজেট মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কতটা পূরণ করতে পারছে, তা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। যাদের উদ্দেশ্য করে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, তারা বাজেট থেকে সুফল পাচ্ছেন কি না, স্থানীয় পর্যায়ে থেকে এ বিষয়গুলোকে তারা কীভাবে মূল্যায়ন করছেন, তা সঠিকভাবে জানা জরুরি। বাজেটের আওতায় বিভিন্ন খাতের কাঠামোগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেগুলো আসলে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, এই উন্নয়নের ফল সবাই সমানভাবে পেল কি না, অঞ্চলভিত্তিক বৈষম্য রয়েছে কি না প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করাও এ সংলাপের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষাপটে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ২০২৩ সালের ৭ জুন রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে 'জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪: অসুবিধাগ্রস্ত মানুষেরা যা পেল' শীর্ষক একটি মিডিয়া ব্রিফিং-এর আয়োজন করে। সংলাপে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, প্ল্যাটফর্মের সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, বিভিন্ন অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং সাংবাদিকসহ প্রায় শতাধিক অংশগ্রহণকারী অংশ নেন এবং তাদের মূল্যবান মতামত উপস্থাপন করেন।

# ১৭ কোটি মানুষের প্রয়োজন বিবেচনায় ঘোষিত বাজেট পর্যাপ্ত নয়

### সূচনা বক্তব্য

অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন করেন নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। তিনি উল্লেখ করেন, ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে যে নারী সম্মেলন হয়েছিল তার আগে পর্যন্ত বলা হতো নারীরা অদৃশ্য। নারীরা যে সমাজে আছেন—তাদের সে অস্তিত্ব সমাজে দৃশ্যমান হয় না। এবারের বাজেট দেখে মনে হয়েছে, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং যারা পিছিয়ে রয়েছেন বা যাদের পিছিয়ে রাখা হয়েছে, তারা এই বাজেটে অদৃশ্য। বাজেট দেখে মনে হচ্ছে, দরিদ্ররা দরিদ্র বলেই সহজাতভাবে তাদের কিছু অধিকার থাকবে না।

### গুণগত মান ও প্রক্রিয়াগতভাবে দুর্বলতর বাজেট এটি

মূল বক্তব্য উপস্থাপনায় নাগরিক প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক ও সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাজেট ঘোষণার পর গত ছয় দিনে অনেক আলোচনা হয়েছে। এই বাজেটে সবচেয়ে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষের জন্য কী আছে? বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, বাজেট সবার জন্য। বাজেট যখন প্রণয়ন করা হয়, তখন সবার জন্যই তা করা হয়। তবে প্রত্যেকটি বাজেটের একটি চরিত্র থাকে। সেই বাজেটে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে সেই অর্থের ব্যবহার কতটা হলো, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্যই আজকের এ আলোচনা। এর বাইরে বাজেটকেন্দ্রিক যে কল্পকথন দেখা দেয়, তার কোনো বৈপরীত্য সৃষ্টি হচ্ছে কি না, সেটিও দেখার বিষয়। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়ে থাকে, আমরা যে সমালোচনা করি তা খুবই গৎবাঁধা। এক্ষেত্রে বলতে হয়, যদি কেউ একই রোগের জন্য ডাক্তারকে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ দিতে বলেন, তাহলে তো ডাক্তারের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। রোগ তো একটাই। সেটি নিয়েই আলোচনা।

তিনি বলেন, একটি অর্থনৈতিক দলিল ও একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গত ১০-১৫ বছরে বাজেট কতখানি উন্নত হল, সেই বিবেচনায় দেখা যায়, বাজেট প্রণয়নের দক্ষতার ক্ষেত্রে ২০০৬ সালে ১০০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬৪ তম। আর এখন আমরা ১০০টি দেশের মধ্যে ৯৫ নম্বরে চলে এসেছি, যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে সাধারণ গড় ৪৫। এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যদের অবস্থান যেখানে ৩৮, সেখানে আমাদের অবস্থান ৯৫। এখানে কেবল অবস্থানের ক্ষেত্রেই


cpd.org.bd
cpd.org.bd
cpdbangladesh
CPDBangladesh

**সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)**
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন), ধানমন্ডি
ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৮১৫৬৯৮৩
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

অবনমন হয়নি, বরং স্কোরের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, অবনমন ঘটেছে। এখানে বাজেটের গুণগত মান বিবেচনা করা হয় না, কেবল প্রক্রিয়া বিবেচনা করে নম্বর দেওয়া হয়। অর্থাৎ, দক্ষিণ এশিয়ায় অন্যান্য যারা বাজেট দিয়ে থাকেন তাদের প্রক্রিয়া আমাদের তুলনায় স্বচ্ছতর ও দক্ষতর।

তিনি আরও বলেন, সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, বিরাট বাজেট দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ বাজেট কতটা বিরাট, তা আমরা দেখব। আবার আমরা বলি যে, বাজেট বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কিন্তু সরকার বাজেট বাস্তবায়ন করে। প্রকৃতপক্ষে কতটা বাস্তবায়ন হয়, সেটিও আমরা দেখব। পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচক কীভাবে ঘোরপ্যাঁচ খাচ্ছে, তা আমরা দেখব। সামগ্রিকভাবে বাজেট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর, তা নিয়ে আলোচনা করব।

তিনি আরও বলেন, এ বিষয়টি অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমছে। এটি নিয়ে আমরা কেউ বিতর্ক করি না। হতদরিদ্র ও সাধারণ দরিদ্র উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, আনুপাতিক হার কমেছে। কিন্তু একই সময়ে বাংলাদেশ একটি বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একদিকে আমাদের দারিদ্র্য কমছে, অন্যদিকে বৈষম্য বাড়ছে। এই বৈপরীত নিয়ে বাংলাদেশ আগামী দিনে এগোতে চায় কি না, তা বিবেচনা করতে হবে। এই বৈপরীত্যের মধ্যে আগামী দিনে আমাদের প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়ন টেকসই হবে কি না, সর্বজনীন হবে কি না এবং তা আমাদের চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। বৈষম্য যে কেবল আয়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান তা নয়, ভোগের ক্ষেত্রেও তা দৃশ্যমান। সরকার ভোগের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সহায়তা দিচ্ছে, বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও ভোগে বৈষম্য বাড়ছে। ২০২২ সালে যে খানা আয়-ব্যয় জরিপ হয়েছে, তাতে সম্পদের বৈষম্যের যে হিসাব পাওয়া গেছে, তা এখনো সরকার প্রকাশ করেনি। ওই সম্পদের বৈষম্য প্রকাশ পেলে দেখা যাবে যে, ভোগ বৈষম্য ও আয় বৈষম্যের তুলনার সম্পদের বৈষম্য অনেক বেশি বেড়েছে। এখনো গ্রামে দরিদ্র মানুষের হার বেশি থাকলেও শহরে বৈষম্যের হার অনেক অনেক বেশি। অর্থাৎ, কর্ম, খাদ্য ও নিরাপত্তার সন্ধানে গ্রামের হতদরিদ্র মানুষ শহরে চলে আসছে। এটিই বাস্তব আমরা দেখছি। এটি টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়ক হচ্ছে, নাকি হচ্ছে না, এ প্রশ্ন থেকেই যাবে। দ্বিতীয়ত, বলা হয়ে থাকে, বড় বাজেট দেওয়া হয় এবং তা বাস্তবায়ন করা হয়। সাধারণ মানুষ বড় বাজেট বিবেচনা করেন টাকার অঙ্কের ভিত্তিতে। আর অর্থনীতিবিদরা হিসাব করেন অর্থনীতির আয়তনের অনুপাতের ভিত্তিতে। সেই বিবেচনায় দেখতে হবে, বাজেট আসলেই বড় কি না। আমাদের অর্থনীতির আকার যত বড় হয়েছে, বাজেটের আকার কি সেই অনুপাতে আমরা বড় করতে পেরেছি? আমরা দেখছি বিশ্বে যেসব দেশ বাজেট প্রণয়ন করে, এমন ১৪৩টি দেশের মধ্যে আনুপাতিক হারে বাজেট দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৩৭তম অবস্থানে আছে বাংলাদেশ। অর্থাৎ, বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণ সরকারি ব্যয় করে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকারি ব্যয়ের মধ্যমা যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যায়, সরকারি ব্যয়ের হার ৩২ শতাংশ। সেখানে বাংলাদেশে সে ব্যয় ১৫-১৬ শতাংশ। তাহলে আমরা কীভাবে বলি যে, আমরা খুব বড় বাজেট দেই? এটি কল্পকথনের চরম উদাহরণ।

বাজেট ঘোষণার সময় বলা হয়, এত বড় বাজেট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাজেট কতটা বাস্তবায়ন হলো যে বিষয়ে কোনো হিসাব নেওয়া হয় না। প্রকৃত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সরকার যে হারে বাজেট বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, তার তুলনায় বাস্তবায়ন অনেক কম। অর্থাৎ, যে বাজেট ঘোষণা করা হয়, তার শতভাগ বাস্তবায়ন হয় না। বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হিসাব করলে দেখা যায়, এটির বাস্তবায়ন ৮০ শতাংশের বেশি হয় না। একমাত্র ২০১৩ সালে এটি ৯০ শতাংশের মতো বাস্তবায়ন হয়েছিল। বাজেট যদি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা না যায়, তাহলে সেটি বড় থাকে কী করে?

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের পর কর আহরণের গতি কমে গেছে। ব্যয়ের ক্ষেত্রেও দুটি বছরে অবনমন পরিলক্ষিত হয়েছে। এ থেকে বলা যায় যে, গণতান্ত্রিক জবাবদিহির ব্যবস্থায় ঘাটতি দেখা দিলে কর আহরণ ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ের ওপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার দেখা যাচ্ছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়লেও সেই অনুপাতে কর আহরণ বাড়ছে না। কর আহরণ জিডিপির ৮ শতাংশেই আটকে থাকছে। তাহলে বড় বাজেট হবে কীভাবে? আপনার হাতে যদি সম্পদ না থাকে, তাহলে আপনি বড় বাজেট দেবেন কীভাবে?

রাজস্ব আহরণ যদি না বাড়ে, তাহলে প্রবৃদ্ধি থেকে সৃষ্ট সম্পদ যাচ্ছে কোথায়? এক্ষেত্রে হয় আয় হয়নি, অথবা আয় হলেও মানুষ কর দেয়নি অথবা যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তা দেশের বাইরে পাচার হয়ে গেছে। আর বাংলাদেশে যে রাজস্ব আহরণ হয়, তার দুই-তৃতীয়াংশই হচ্ছে পরোক্ষ কর। এক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির আয় করার ক্ষমতা থাক বা না থাক, তাকে কর দিতে হচ্ছে। আবার যার অনেক সামর্থ্য আছে, সেও একই হারে কর দিচ্ছে। এমন পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীল কোনো সমাজ সাম্যের কথা বলতে পারে না। বৈষম্য তারই পরিচায়ক। প্রত্যক্ষ কর এক-তৃতীয়াংশের ওপরে আর উঠল না। এক্ষেত্রে ২০১৪ ও ২০১৮ সাল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে দুটি মাইলস্টোন হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা, সম্পদ কর না থাকা এবং প্রত্যক্ষ কর আহরণ কম হওয়া বৈষম্যের মৌলিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত। আমরা কি আমাদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত দিয়ে উন্নয়ন ব্যয় মেটাতে পারছি? নাকি এটি দেশি-বিদেশি ঋণের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল। এখনো উন্নয়ন কর্মসূচির প্রায় ৪০ শতাংশ বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল।

এবারের বাজেটে যে কাঠামোটি দেওয়া হয়েছে, তা কতখানি যৌক্তিক, তা নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। আমরা একাধিকবার বলেছি, অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে উচ্চ প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা উচিত নয়। এখানে মূল্যস্ফীতি রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে একটি স্থিতিশীল অবস্থা ধরে রাখতে হলে একটু নিম্ন পর্যায়ের প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করতে হবে। বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি এখন আর কোনো পরিসংখ্যানের বিষয় না। এটি একটি রাজনৈতিক অভিলাষের প্রকাশ। রাজনৈতিক

অভিলাষ হিসেবে প্রবৃদ্ধি সাড়ে সাত বা তার বেশি করা হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এটি সাড়ে ছয় শতাংশের ওপরে উঠতে পারছে না। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য যে সাড়ে সাত শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ও তার জন্যে যে ধরনের আমদানি ও বিনিয়োগ প্রয়োজন, দুইটি সংগতিপূর্ণ নয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক উৎসাহ সৃষ্টির জন্য এটি দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে, সরকারি বিনিয়োগ খুব একটা বাড়বে না। এটি ওই সাড়ে সাত শতাংশ গতবার যেটা ছিল, তার থেকে কমে গিয়ে ৬.৩ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হচ্ছে। অন্যদিকে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ, যেটা গত বছর ২৪ শতাংশের মতো ছিল, সেটি ২০২৩ সালে হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে এটি বাড়িয়ে ২০২৪ সালে ২৭.৪৩ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য যে অনুকূল পরিস্থিতি দরকার, তার উপস্থিতি নেই। মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে ৬ শতাংশের প্রাক্কলন দেওয়া হচ্ছে। অথচ বিবিএসের হিসাবই বলছে যে, মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের কাছাকাছি অবস্থান করছে। বিবিএস একরকম পরিসংখ্যান দিচ্ছে, আবার অর্থ মন্ত্রণালয় আরেক রকম প্রাক্কলন দিচ্ছে। তাহলে এ দুটির মধ্যে কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান হবে? ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ এখন পর্যন্ত এ খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি ১১ শতাংশের মতো। প্রাক্কলন ও বাস্তবতার মধ্যে বড় ব্যবধান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে কেবল বাজেটই নয়, সরকার মুদ্রানীতিও বাস্তবায়ন করতে পারছে না। প্রবৃদ্ধির জন্য যে বিনিয়োগ, ঋণ, যন্ত্রপাতির সরবরাহ বাড়ানো ও আমদানি প্রয়োজন, তার সংস্থান নেই। ফলে সরকারের পরিসংখ্যানগুলো একটি দুষ্টচক্রের মধ্যে আটকে গেছে। কারণ এগুলো একটি আরেকটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। একইভাবে রিজার্ভের ক্ষেত্রেও কোনো সংগতি দেখা যাচ্ছে না। গত বছর ৪৬ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ ছিল, যা এবার অর্ধেকে নেমে এসেছে। আর বিনিময় হার আগামী অর্থবছরে ১০৪ টাকায় ধরে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও এরই মধ্যে তা ১০৮ টাকা হয়ে গেছে। এভাবে পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে সবার প্রত্যাশা থাকে সরকার বাজেটে জনতুষ্টিমূলক মনোগ্রাহী পরিকল্পনা ঘোষণা করবে। কিন্তু আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে যে, সেই ধরনের ন্যূনতম চেষ্টা এই বাজেটে দেখানো হয়নি। এটি নির্বাচনের বছরের বাজেট হলেও নির্বাচনী বাজেট নয়। নির্বাচনী বাজেটের জন্য যে ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও সম্পদ দরকার পড়ে, এ বাজেট করার সময় তেমন পরিস্থিতি ছিল না। এর বিপরীতে বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্ত নিয়ে খেলা করা হয়েছে।

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেগুলো সেখানে থাকার কথা নয়। যেমন কৃষিতে দেওয়া ভর্তুকি সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে দেখানো হয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আবার যেসব ক্ষেত্রে কর রেয়াত দেয়া হচ্ছে সেগুলোকে ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এটিও গ্রহণযোগ্য নয়। ভর্তুকি, কর রেয়াত আর সামাজিক নিরাপত্তা সবকিছু একসঙ্গে করে ফেলা হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে এই সংখ্যাটা বড় দেখা যায়। কারণ রাজস্ব সক্ষমতা এত নেই যে, সামাজিক নিরাপত্তায় বরাদ্দ বাড়ানো যাবে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে দেওয়া বরাদ্দের প্রায় ৫৫ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বিবেচ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। গ্রহণযোগ্য সামাজিক সুরক্ষা একসময় ৬২ শতাংশ ছিল। সেটি হ্রাস পেয়ে এখন ৩০ শতাংশের নিচে চলে এসেছে। আর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দের ক্ষেত্রে আগে দেখা যেত যে, শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশ এবং স্বাস্থ্যে জিডিপির ১ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হতো। এবার সেই বরাদ্দ ২ শতাংশ ও ১ শতাংশের নিচে চলে এসেছে। তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, স্বাস্থ্যে আসলে বরাদ্দ শূন্য দশমিক ছয় শতাংশ। আর শিক্ষায় সেটি দেড় শতাংশের মতো। এক্ষেত্রে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, রাজনৈতিক কল্পকথা হিসেবে যারা দাবি করেন যে তারা যে বাজেট দেন, তারা সেটি বাস্তবায়ন করেন - তথ্য-উপাত্ত তাদের সে বক্তব্যকে সমর্থন করে না। বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২০-৪০ শতাংশ ঘাটতি রয়ে গেছে। আবার যারা বলেন, 'বড় বাজেট দেই' সেই বক্তব্যও তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত নয়। বাজেট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি থেকে যাচ্ছে এবং যেটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে, সেটি সুষমভাবে হচ্ছে না। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো আরও বেশি হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বিকেন্দ্রীকৃত পর্যায়ে এ ঘাটতিগুলো আমরা আরও বড়ভাবে দেখছি। আর আমরা যতটুকু এগিয়েছি, সেই এগোনোটা আমাদের সঙ্গে তুলনীয় দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। গত দেড় দশকের অর্জন টেকসই করতে হলে এবং সেটির সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হলে বাজেটের কাঠামোয় যেসব ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণ করা দরকার। গণতান্ত্রিক জবাবদিহি না থাকলে বাজেট সঠিকভাবে প্রণয়ন করা যায় না এবং সেটির বাস্তবায়ন আরও কঠিন হয়ে পড়ে। একটি সরকার টানা তিন মেয়াদে ক্ষমতায় থেকেও যদি একটি গুণমানসম্পন্ন বাজেট দিতে না পারে, তা হলে বিগত সময়ে সরকার যে ভালো কাজগুলো করেছে, সেগুলোর কৃতিত্ব নিতে পারে না।

## বাজেটে কোভিডকালের শিখন ক্ষতির স্বীকৃতি নেই

বাজেটে শিক্ষা-বিষয়ক পদক্ষেপের আলোচনায় ব্র্যাক শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রোগ্রাম হেড সমীর রঞ্জন নাথ বলেন, একসময় ক্রীড়া, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের বাজেট শিক্ষার বাজেটের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হতো। হাল আমলে এর পরিবর্তন হয়েছে। এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ শিক্ষা বাজেটের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। এতে বোঝা যাচ্ছে শিক্ষার বাজেট বলে যেটিকে উল্লেখ করা হচ্ছে, সেটি আসলে নিরেটভাবে শিক্ষার বাজেট নয়। এবারের বাজেটে ১৩.৭ শতাংশ শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। আমরা হিসাব করে দেখেছি, শিক্ষার বাজেট দাঁড়িয়েছে ১১.৬ শতাংশ। বাকিটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতের বরাদ্দ। বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথমিক শিক্ষায় বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে ৪.৬ শতাংশ, মাধ্যমিক শিক্ষায় ৫.৬ শতাংশ ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ১.৪ শতাংশ। এভাবে পৃথকভাবে

দেখলে বোঝা যায়, শিক্ষায় বরাদ্দ বাজেটের অংশ হিসেবে অনেক কম। গতবারের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, সামগ্রিক বাজেটে বেড়েছে ১২.৩ শতাংশ, কিন্তু শিক্ষায় বাজেট বেড়েছে ৮.২ শতাংশের মতো। তার মানে সামগ্রিক বাজেট যে হারে বেড়েছে, শিক্ষার বরাদ্দ সে হারে বাড়েনি। তাছাড়া বাজেটে শিক্ষায় যে বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়, তার পুরোপুরি খরচ হয় না। ২০২১-২২ অর্থবছরে শিক্ষা বাজেটের ৮৪ শতাংশ ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। আর যে অর্থটা কাটছাঁট হয়েছে, তার প্রায় পুরোটাই উন্নয়ন বাজেট থেকে। তাহলে বাজেট ঘোষণার সময় উন্নয়ন বাজেটের আকার এত বড় দেখিয়ে লাভ কি?

তিনি উল্লেখ করেন, মোট বাজেটের ২০ অথবা দেশের মোট জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে শিক্ষানীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। শিক্ষা খাতে প্রকৃত বরাদ্দ সেই লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। শিক্ষা ও দক্ষতার বিষয়ে বাজেটে যে অধ্যায় রয়েছে, সেখানে কোভিড-১৯ বিষয়ে একটি শব্দও নেই। দেশে যে একটি অতিমারি বয়ে গেল, সে বিষয়ে কোনো স্বীকৃতিই সেখানে নেই। তার মানে কি শিক্ষায় কোভিডের কোনো প্রভাব পড়েনি? এমনকি শিক্ষায় যে প্রান্তিকতা রয়েছে, সেটিরও স্বীকৃতি এখানে নেই। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের কোনো কথা বাজেটে নেই। এমনকি কোনো প্রতিশ্রুতিও নেই যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কী কী করা হবে। সব ক্ষেত্রেই কেবল বর্ণনা করা হয়েছে সরকারের যেসব উদ্যোগ বাস্তবায়ন হয়েছে, সেসব বিষয়ের। বাজেটে কোনো নতুন কিছু দেখি না। উপরন্তু কলমে ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। এটি কোনোভাবেই ঠিক হয়নি। করোনার কারণে লার্নিং লস বা শিখন ক্ষতি হয়েছে। সেই শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বাজেটে কোনো স্বীকৃতিই নেই। এটি অস্বীকার করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যেসব শিশুর পিতামাতা লেখাপড়া জানেন না, তাদের শিখন ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। সেই শিশুরাই অসুবিধাগ্রস্ত শিশু। কিন্তু তাদের জন্য বাজেটে কোনো বক্তব্য নেই। আর বই বিতরণের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, গতবারের তুলনায় এবার ৩২ লাখ কম বই বিতরণ করা হয়েছে। এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার।

## প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি সর্বজনীন স্বাস্থ্যনীতি বাস্তবায়ন করতে হবে

দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ডা. দিবালোক সিংহ বলেন, বর্তমানে দেশে ১৮.৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। এর মধ্যে ৫.৬ শতাংশ অতিদরিদ্র। ১৭ কোটি জনসংখ্যার দেশে এই সংখ্যাটি অনেক বড়। বাংলাদেশে গত ৫২ বছরে খুবই শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণি আবির্ভূত হয়েছে। এর বিপরীতে কোটি কোটি মানুষ দরিদ্র, অসহায় ও বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন। এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দরিদ্র শ্রেণির স্বাস্থ্যসেবা প্রাধান্য পাওয়ার বিষয়টি প্রত্যাশা করা একটি উচ্চাশা বলেই আমার ধারণা। স্বাস্থ্য খাতের গত ১০ বছরের বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ খাতে বরাদ্দ একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ সর্বনিম্নে অবস্থান করছে। এরফলে যা ঘটছে তা হলো, বাংলাদেশে প্রতি ১০ হাজার জনগোষ্ঠীর বিপরীতে মাত্র চারজন সেবিকা ও পাঁচজন ডাক্তার সেবা দিচ্ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, ডাক্তার, নার্স ও ধাত্রী থাকতে হবে ২৩ জন। সেই সংখ্যা থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার গুণমান অব্যাহতভাবে নিম্নগামী। এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। দেশে সংক্রামক ব্যাধির তুলনায় অসংক্রামক ব্যাধিতে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ৬৭ শতাংশ মৃত্যু সংঘটিত হচ্ছে অসংক্রামক ব্যাধির কারণে। এর মধ্যে চারটি রোগ সবচেয়ে বেশি সমস্যার সৃষ্টি করছে। এগুলো হলো ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট এবং স্ট্রোক। এসব সমস্যার পাশাপাশি আরও যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা হলো প্রায় ৩০ শতাংশ শিশু জন্ম নিচ্ছে কম ওজন নিয়ে। শিশুদের যেসব সমস্যা সবচেয়ে বেশি হচ্ছে সেগুলো হলো নিউমনিয়া, ডায়রিয়া ও অপুষ্টি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে ৩৮ হাজার ৭৮৯ কোটি টাকার মতো বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যদি উন্নত করতে হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। তা না হলে ব্যক্তির স্বাস্থ্য ব্যয় অনেক বেড়ে যাবে। আমাদের যে স্বাস্থ্য ব্যয় হয়, তার ১৭ শতাংশ আসে সরকারের তরফ থেকে। সাড়ে ৬ শতাংশ আসে অনুদান থেকে। বাকি ব্যক্তির পকেট থেকে খরচ হয় ৭৪ শতাংশ। সে কারণে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ প্রতিবছর এই স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় মেটাতে গিয়ে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছে। সরকারের স্বাস্থ্য নীতিতে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা ধরা আছে, কিন্তু বাজেটে তার কোনো প্রতিফলন নেই। এই বাস্তবতায় আমার দাবি, বাজেটের অন্তত ১৫ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দিতে হবে। একই সঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় বর্তমানে স্বাস্থ্য বাজেটের যে ২৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, সেটি বাড়িয়ে ৩৫ শতাংশ করার দাবি জানাচ্ছি।

## সামাজিক সুরক্ষা ব্যয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

সিপিডি'র সিনিয়র রিসার্চ ফেলো তৌফিকুল ইসলাম খান উল্লেখ করেন, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ আগের বছরের তুলনায় সামান্য বেড়েছে। এক লাখ ২৬ হাজার কোটি টাকা এবারের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটি ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় কিছুটা বেশি। সংশোধিত বাজেটে ছিল এক লাখ ১৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি তো হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশনের অর্থ। এর বাইরে কৃষি ভর্তুকি ও জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদের একটি অংশ রয়েছে। এই সামাজিক নিরাপত্তার বরাদ্দের মধ্যে ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ বা দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের বরাদ্দও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব বরাদ্দকে এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে এটিকে জটিল বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। ফলে বাজেটের প্রকৃত রূপ বুঝতে অনেক অসুবিধা হয়। আইএমএফের পক্ষ থেকেও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্ক উল্লেখ করার শর্ত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাজেটে সেটি সঠিকভাবে আসেনি। সামগ্রিকভাবে মনে হয়েছে, এবার সামাজিক নিরাপত্তা খাতে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেশে একটি উচ্চ মূল্যস্ফীতি চলছে। সাধারণভাবে এ মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশেরও ওপরে বলে আমাদের

ধারণা। সরকার মূল্যস্ফীতির যে হিসাব দিচ্ছে, প্রকৃত মূল্যস্ফীতি তার চেয়েও অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও খাদ্য-সম্পর্কিত যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম রয়েছে, সেগুলোর বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকার এটির মধ্যে খুব বেশি মনোযোগ দেয়নি। সম্পূর্ণরূপে জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে এ খাতে বরাদ্দ প্রাক্কলন করা হয়েছে। অথচ সরকার বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বাবদ ৫৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এছাড়া ইকুইটি বাবদ ২৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি রিজার্ভ তহবিল হিসেবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সবগুলো মিলে এক লাখ ১৬ হাজার কোটি টাকা। এ অর্থ সরকার যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারবে। অথচ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে কোনো অর্থ নেই! তারা চিন্তা করতে পারল না যে, ওএমএস কার্যক্রমে একটু বরাদ্দটা বাড়াই। আর যে অর্থই বরাদ্দ দেওয়া হোক না কেন, সেটি সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছানোটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ১০ বছর ধরে ন্যাশনাল হাউজহোল্ড ডেটাবেজ তৈরির কথা শোনা যাচ্ছে, যেটি প্রণীত হলে প্রকৃতপক্ষে কার সামাজিক নিরাপত্তার সুবিধা প্রয়োজন, সেটা জানা যেত। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই ডেটাবেজ করা সম্ভব হলো না। এ খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু ডেটাবেজ আর করা হয়নি। কিন্তু যারা এ অর্থ নষ্ট করল, তাদের ক্ষেত্রে সরকারের অবস্থান কী? তারা কি পুরস্কৃত হয়েছেন, নাকি তিরস্কৃত হয়েছেন, সে বিষয়ে কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। জনগণের করের অর্থ যারা এভাবে অপচয় করছেন, তাদের জবাবদিহিতা থাকা উচিত। আর সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ কোন ক্ষেত্রে কীভাবে বিতরণ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এটি আদৌ খরচ হচ্ছে কি না, তার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি।

## নারীদের উন্নয়নের বাজেট সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং জোরদার করতে হবে

মহিলা পরিষদের সভাপতি ফৌজিয়া মোসলেম নারী বাজেটের বিষয়ে বলেন, আমরা এখানে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে আলোচনা করছি। এক্ষেত্রে নারী সব ক্ষেত্রেই অসুবিধাগ্রস্ত, সে যত উচ্চবিত্তই হোক বা হতদরিদ্রই হোক। তবে বাজেটে একটি অগ্রগতি হচ্ছে, অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি আমরা একটি নারী বাজেটও পাচ্ছি। অর্থাৎ নারীদের বিষয়টি আলাদাভাবে ভাবা হচ্ছে, এটি বেশ আশার সঞ্চার করে। এই নারী বাজেট দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। এবারের নারী বাজেটের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে, ৩২ হাজার ১১০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। গতবার নারী বাজেটের আকার ছিল ৩৩.৮৪ শতাংশ। এবার তা হয়েছে ৩৪.৩৪ শতাংশ। সামান্য কিছুটা বৃদ্ধি ঘটেছে। নারী বাজেটকে তিনটি থিমে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধি, সামাজিক মূল্যায়ন ও সরকারি সেবায় নারীর অভিগম্যতা বৃদ্ধি। এই থিমগুলো মোটামুটি ঠিক আছে। কিন্তু এই থিমের মধ্যে বরাদ্দ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কোন জায়গায় জোর দিতে হবে, সে বিষয়ে কিছুটা ব্যত্যয় আছে বলে আমার মনে হয়েছে। নারীর দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে তাকে যত বেশি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা যাবে, নারীর মর্যাদা তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সবচেয়ে কম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আর নারীদের জন্য প্রদত্ত বাজেট নারী উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখছে বা আদৌ কোনো ভূমিকা রাখছে কি না, সে বিষয়ে কোনো মূল্যায়ন নেই। কাজেই নারী বাজেটের মাধ্যমে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন হচ্ছে কি না, সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। সেটি মনিটরিংয়ের জন্য পৃথক একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন।

বাল্যবিবাহ আমাদের দেশের অন্যতম বড় সমস্যা। কিন্তু নারীর উন্নয়নের মানদণ্ডে কোথাও বাল্যবিবাহের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সহিংসতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলেও শিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া বা বাল্যবিবাহের মতো বিষয়টিকে সেখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদন অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের শীর্ষে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রেও শীর্ষে বাংলাদেশ। দুটো ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ কীভাবে শীর্ষে থাকল, তা আমার বোধগম্য নয়।

## জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অভিযোজন খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে

জলবায়ু পরিবর্তন ও জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়ে সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর অন্যতম। জলবায়ু অভিঘাতেরও সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। খরা, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, ঝড়, নদীভাঙন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব চরাঞ্চল, উপকূল ও প্রান্তিক এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ওপরই এর অভিঘাত সবচেয়ে বেশি। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে যে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, তার ৯০ শতাংশই সংঘটিত হয় সাইক্লোন ও ঝড়ের কারণে। দারিদ্র্য ও অসমতা বৃদ্ধির পেছনেও জলবায়ু পরিবর্তন দায়ী। এরফলে দেশের অভ্যন্তরে অভিবাসন ত্বরান্বিত হয়। এর পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামগ্রিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত নানামুখী - অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত।

জলবায়ু কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ২০১৪ সালে ক্লাইমেট ফিসক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই কাঠামোর আওতায় ২৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ যারা জলবায়ু নিয়ে কাজ করে, তারা জলবায়ু কার্যক্রমের বিষয়ে একটি হিসাব দেয়। কিন্তু এসব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই। আর এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, জলবায়ু ক্ষেত্রে যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটি খুবই নগণ্য। এটি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে নিট বরাদ্দ কমে যায়। পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের বাজেট যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, মোট বাজেটের তুলনায় সেটির বরাদ্দ অনেক কম।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। আর এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নিম্ন

আয়ের ও প্রান্তিক মানুষ। কিন্তু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতে বাজেট বরাদ্দ আশানুরূপভাবে বাড়ানো হচ্ছে না। আর জলবায়ু খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে, তার বেশিরভাগ অর্থ ব্যয় হচ্ছে প্রশমন খাতে। অভিযোজন খাতে বরাদ্দ কম যাচ্ছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী এ থেকে কম উপকার পাচ্ছে।

আর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্যতম দায়ী হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি। জীবাশ্ম জ্বালানি পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ অন্যান্য প্রয়োজনে জ্বালানি পোড়ানোর কারণে যে কার্বন নিঃসরণ হয়, তা হ্রাস করতে হলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। তবে সেই কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিকল্প জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে, তা হচ্ছে সুলভ মূল্যে সবার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ। কিন্তু উপখাত হিসেবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ খাতে বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে বরাদ্দের ভারসাম্য আনতে হবে। অভ্যন্তরীণ ও নবায়নযোগ্য খাত থেকে জ্বালানি সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। কেননা নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য সরকারের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

## দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য পুঁজি বাজারকে শক্তিশালী করতে হবে

নাগরিক প্ল্যাটফর্মের কোর গ্রুপ সদস্য আসিফ ইব্রাহিম বলেন, ব্যক্তি খাতের কাছে বর্তমানে যেসব বিষয় গুরুত্ব বহন করছে তার মধ্যে রয়েছে জ্বালানি তেলের দামের ঊর্ধ্বগতি, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যাঘাত এবং তার ফলে মূল্যস্ফীতির ওপর যে প্রভাব পড়েছে সেটি। জ্বালানি তেল, ইউরিয়া সার, গমসহ অন্যান্য পণ্যের দাম গত বছরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার এক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা ও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজেটে কী ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, আমরা সে বিষয়টি দেখতে চেয়েছি এবারের বাজেটে। তাতে দেখা যায়, সরকার চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরবরাহ বাড়িয়ে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলছে।

আগামী অর্থবছরে ব্যক্তি খাতে ২৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগের একটি বড় লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। সেই বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য একটি টেকসই ও মানসম্পন্ন অবকাঠামো প্রয়োজন। এছাড়া ব্যবসা পরিচালনা সহজীকরণ প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও অন্যান্য সংস্থার সেবায় অটোমেশন আনয়ন জরুরি। কিন্তু এসব সংস্থার সেবার অটোমেশন কার্যক্রম খুবই স্থবিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই, বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেমন দেশব্যাপী ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে - সেগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন করা উচিত। এর বাইরে আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়হীনতা দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং বেসরকারি খাত সরকারি যেসব প্রতিষ্ঠানে সেবা গ্রহণ করে, সেখানে দুর্নীতি হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে।

জনাব আসিফ ইব্রাহিম বলেন, আমার আরেকটি পরিচয় হচ্ছে, আমি চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি। একটি দুঃখজনক ব্যাপার হলো সমগ্র বাজেট বক্তৃতায় পুঁজিবাজার বিষয়ে একটি শব্দও উল্লেখ করা হয়নি। যেকোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য পুঁজিবাজারের বিকাশের বিকল্প নেই। ব্যাংক খাতের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করা হলে তার যে কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, তা এরই মধ্যে প্রত্যক্ষ করা গেছে।

## উপসংহার

সমাপনী বক্তা হিসেবে সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাজেটের প্রেক্ষিতে বণ্টনের ন্যায্যতা ও বাস্তবায়নের দক্ষতা এ দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত সাধারণ মানুষের জন্য। কারণ বাজেটের মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বণ্টন নিশ্চিত হয়। সুতরাং বাজেটের অর্থ আমরা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারছি কি না, সে বিষয়টি খুবই প্রণিধানযোগ্য। এ ব্যয় আমরা সাশ্রয়ী উপায়ে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে পারছি কি না, সেটি বিবেচনার দাবি রাখে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলাদেশে সরকার যদি এক টাকা বিনিয়োগ করে, তাহলে বেসরকারি খাত তিন টাকা বিনিয়োগ করে। কিন্তু সরকারের এই এক টাকার বিনিয়োগই বেসরকারি খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত ও প্রণোদিত করে। কাজেই সরকারি বিনিয়োগে কোনো ব্যত্যয় ঘটলে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগের ওপর তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, কাঙ্ক্ষিত কর্মসংস্থান হয় না এবং সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য উপাদান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উন্নয়ন বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রায় ১২৫০টি প্রকল্প রয়েছে। এর মধ্যে ৮৭৮টি প্রকল্প ২০২৩-২৪ বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে; এর একটি বড় অংশ আগের বছরের মেয়াদোত্তীর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১ চতুর্থাংশ প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় ধরে চলছে। মেয়াদের চেয়ে বেশি সময় ধরে বাস্তবায়নের কারণে এটির ব্যয় বেড়ে যায়। এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর অভিঘাত গিয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। এক্ষেত্রে বাস্তবায়নে দক্ষতার প্রশ্ন এসে যায় যে সমস্যা বছরের পর বছর চলছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন করতে হলে ২০২২-২৩ অর্থবছরের তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশী বাস্তবায়ন করতে হবে। কিন্তু সেই ৩৩ শতাংশ বাস্তবায়ন বৃদ্ধি করার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া হবে বাজেটে কি তার কোনো রূপরেখা আছে? এডিপি বাস্তবায়নে গতি সঞ্চারের জন্য আইএমইডির কার্যক্রমকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। এর পাশাপাশি যেসব কর্মকর্তার গাফিলতির কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়, তাদেরকে

জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। আর যারা বাস্তবায়নে ভালো করবে, তাদের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে। দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে তাদের যথাযথ জায়গায় নিয়োগ দিতে হবে। যারা প্রকল্পসমূহের ফলাফলের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট তাদের সমন্বয়ে সামাজিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সভাপতি

*অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল*
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং সদস্য, সিপিডি বোর্ড অফ ট্রাস্টি

মূল প্রতিবেদন উপস্থাপক

*ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

সম্মানিত আলোচক

*ড. দিবালোক সিংহ*
নির্বাহী পরিচালক, দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র

*জনাব সমীর রঞ্জন নাথ*
প্রোগ্রাম হেড, ব্র্যাক-আইইডি

*ড. ফওজিয়া মোসলেম*
সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

*জনাব আসিফ ইব্রাহিম*
কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং ভাইস-চেয়ারম্যান, নিউ এজ গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ

*ড. ফাহমিদা খাতুন*
নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

*জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান*
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

সমাপনী বক্তা

*অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান*
সম্মাননীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) এবং কোর গ্রুপ সদস্য, নাগরিক প্ল্যাটফর্ম

ব্রিফিং নোট প্রস্তুত করেছেন : মোঃ মাসুম বিল্লাহ্
সিরিজ সম্পাদনায় : অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সহযোগী সম্পাদক : অভ্র ভট্টাচার্য

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ